দৈনিক বাংলা
তারিখ 13 APR 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষা ব্যাহত

দারিদ্র্যের কারণে শিশু-কিশোররা স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছে

দেশের বিভিন্ন স্থানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বিপুল সংখ্যক শিশু-কিশোর স্কুলে ভর্তি হবার পর দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। শিক্ষক, বিদ্যালয়গৃহ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা সরঞ্জামের অভাবে বহু জায়গায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা গাইবান্ধা থেকে জানান, জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। স্কুল গমনোপযোগী ছেলে-মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়নি।

শিক্ষা বিভাগের এক জরিপ রিপোর্টে জানা গেছে, জেলায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী ছেলেমেয়ের সংখ্যা মোট ৩ লাখ ৩ হাজার ৯শ ৫১ জন।

চলতি শিক্ষা বছরে এদের মধ্যে জেলার বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে ২ লাখ ২৮ হাজার ৪শ ৭০ জন। বাকী ৭৫ হাজার ৪শ ৮১ জন ছেলেমেয়ে এখনও স্কুলে ভর্তি হয়নি বা লেখাপড়া করছে না।

উপরন্তু ভর্তি করা ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে আবার প্রায় ৬০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে আসছে না। ফলে কাগজে-কলমে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যা দেখানো হয়েছে বাস্তবে তত ছাত্র-ছাত্রী স্কুলগুলোতে আর পড়াশুনা করছে না।

জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ জন এবং ২ জন শিক্ষক দিয়ে স্কুল চালানোর নজীর রয়েছে প্রায় ২০টি। উপযুক্ত ঘর নেই তবু স্কুল চলছে এমন নজীর প্রায় ৩০টি। শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৯৬টি।

জেলার পুরাতন স্কুল ভবনগুলোর অধিকাংশরই এখন জরাজীর্ণ দশা। ৭শ ৩৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের ১শ'টিরও বেশীর অবস্থা এখন নড়বড়ে। অবশ্য চলতি অর্থ বছরে থানা প্রকৌশল অধিদফতরের অধীনে প্রায় ৫০টি ভবনের পুনঃ নির্মাণ ও মেরামতের কাজ হচ্ছে।

নদী ভাঙ্গন এবং ঝড়ে বিধ্বস্ত প্রায় ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন না থাকায় অস্থায়ী ঘরে এখন ক্লাস চলছে। এছাড়াও আরও ২১টি ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল ভবন রয়েছে সেগুলোতে যে কোনে মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ভবন না থাকার কারণে দীর্ঘকাল পরে সম্প্রতি গোবিন্দগঞ্জ থানার শোলাগাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

জেলায় শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৯৬টি। গত ৩ বছর থেকে এই অবস্থা চলছে। গোবিন্দগঞ্জ থানার বেউরগ্রাম এবং সুন্দরগঞ্জ থানার কাপাসিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটিতে মাত্র ১ জন করে শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।

২ জন শিক্ষকের স্কুল রয়েছে ১৭টি। এর মধ্যে ফুলছড়ি থানার চর কৃষ্ণমনি ও চর খাটিয়ামারা, সুন্দরগঞ্জ থানার উজানবুড়াইল ও চর কাপাসিয়া অন্যতম। বাকী এধরনের স্কুল রয়েছে সদর, সাঘাটা এবং ফুলছড়ি থানায়।

গ্রামাঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা যেমন কম-উপস্থিতির হারও তদনুরূপ। শিক্ষকরাও নিয়মিত ক্লাস করেন না। যারা আসেন তারাও নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে আসেন।

স্কুল পরিদর্শনে সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা এবং শিক্ষা কর্মকর্তাদের তেমন দেখা যায় না। ফলে শিক্ষকদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন তেমন কোন সমস্যা হয় না। এই কারণে শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে অচলাবস্থা।

কুষ্টিয়া

সংবাদদাতা কুষ্টিয়া থেকে জানান, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হলেও কুষ্টিয়া জেলার প্রায় ১ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এছাড়াও বিদ্যালয়ে ভর্তির পর শতকরা ২৫ ভাগ শিশু দারিদ্র্যের কারণে স্কুল ছেড়ে দেয়।

সংশ্লিষ্ট অফিস সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়া জেলাতে শিক্ষালাভের যোগ্য শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ। এর মধ্যে স্কুলে যায় প্রায় ২ লাখ। বাকী প্রায় ১ লাখ বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

কুষ্টিয়া জেলা সদর, কুমারখালী, খোকসা, ভেড়া-মারা মিরপুর ও দৌলতপুর থানার বিদ্যালয়গুলোতে গত জানুয়ারী মাসে যে সংখ্যক শিশু ভর্তি হয়েছে তার মধ্যে এখন ৭৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত ক্লাস করছে। অবশিষ্ট ২৫ ভাগ শিশু ২/১ মাস বই নিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার পর দারিদ্র্য ও সচেতনতার অভাবে এবং পিতামাতার অনুৎসাহের কারণে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে না।

এসব শিশুরা পিতা-মাতার কাজে সহযোগিতা করা ছাড়াও রাখাল, জুতা পালিশ, হোটেলের বয়, তামাক, বিড়ি ও আইসক্রীম ফ্যাক্টরী ও বাসা-বাড়িতে কাজ করছে।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণে এসব শিশু স্কুলে যেতে পারছে না। ফলে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে।